বিবেকানন্দের রাম ও রামায়ণ ভাবনা : প্রসঙ্গ ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’

বিশ্বজিৎ রায়

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই সভ্যতা ও সংস্কৃতির তুলনা ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালে ভারতীয়দের পক্ষে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ব্যক্তিগত ভাগ্যান্বেষণে, বাণিজ্যিক কারণে ও প্রশাসনিকতার সূত্রে ভারতবর্ষে আসা বিদেশিরা এদেশের মানুষদের একভাবে দেখতেন ও বিচার করতেন। সেই বিচার অনেকক্ষেত্রেই পক্ষপাত দোষদুষ্ট, বিশেষত প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার দাপটে ও সেই ক্ষমতার চশমা চোখে থাকার ফলে ভারতবর্ষীয়দের ‘অসভ্য’ বলে মনে করতেন একদল—আর একদল ভারতবর্ষীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি আনুকূল্য প্রকাশ করতেন ঠিকই তবে সেই আনুকূল্য প্রকাশের সময় ভারতবর্ষীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্য জ্ঞানকাণ্ডের ব্যবহৃত ফিতে দিয়ে মাপতেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানকাণ্ডের নিক্তিগুলিকেই তাঁরা কেবল বিশ্বজনীন বলে মনে করতেন। সেই কল্পিত বিশ্বজনীনতার পাশ্চাত্য মাপের সঙ্গে এ-দেশের যা-কিছু মিলত তা সাহেবদের প্রশংসা পেত। শুধু তাই নয়, অনেক সময় পাশ্চাত্যের জ্ঞানকাণ্ডের সঙ্গে কাঠামোগত দিক দিয়ে মেলানোর জন্য ভারতবর্ষীয় ভাবনা ও বিষয়কে খণ্ডিত করার প্রয়োজন প্রাচ্যবিদ্যাচর্চাকারী সাহেবরা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। এ-বিষয়টি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘কমলাকান্তের দপ্তরে’র অন্তর্গত একটি রচনায় তির্যক মন্তব্য করেছিলেন। বিলিতি সাহেবরা ব্রাহ্মণদের দোকান দখল করে নিয়ে বিলিতি ছুরি-কাঁচি সহযোগে ভারতবর্ষীয় নারকেল ব্যবচ্ছেদ করতে তৎপর। এই হল কমলাকান্তের মতে ‘Asiatic Researches’।

বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের অননুকরণীয় ভাষা উদ্ধার না করলে অন্যায় হবে :

‘‘আমি এই সকল দেখিতে শুনিতেছিলাম, এমত সময়ে সহসা দেখিলাম যে, ইংরেজ দোকানদারেরা, লাঠি হাতে, দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণদিগের ঝুনা নারিকেলের গাদার উপর গিয়া পড়িলেন, দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা নারিকেল ছাড়িয়া দিয়া, নামাবলি ফেলিয়া, মুক্তকচ্ছ হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন সাহেবরা সেই সকল পরিত্যক্ত নারিকেল দোকানে উঠাইয়া লইয়া আসিয়া বিলাতী অস্ত্রে ছেদন করিয়া, সুখে আহার করিতে

শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, 'এ কি হইল?' সাহেবরা বলিলেন, 'ইহাকে বলে Asiatic Researches'। আমি তখন ভীত হইয়া আত্মশরীরে কোন প্রকার Anatomical Researches আশঙ্কা করিয়া, সেখান হইতে পলায়ন করিলাম।"

বঙ্কিমের কমলাকান্ত সন্দেহ নেই 'Asiatic Researches' শব্দবন্ধটি শ্লিষ্টার্থে প্রয়োগ করেছিলেন। বঙ্গদেশে উইলিয়াম জোন্সের নেতৃত্বে যে-এশিয়াটিক সোসাইটি গড়ে উঠেছিল তারই গবেষণাপত্রের নাম *Asiatic Researches*। প্রাচ্যবিদ্যাবিদ সাহেবরা এই গবেষণাপত্রে এশিয়া ও প্রাচ্যবিষয়ে তাঁদের যে-অভিমত প্রকাশ করতেন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্যের জ্ঞানতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার কাঠামো অনুসারী। এই পত্রটি সম্বন্ধে বঙ্কিমের মনোভাব জটিল, সমালোচনাধর্মী (critical)—প্রয়োজনে এই পত্রে প্রকাশিত গবেষণা তথ্য তিনি নিজের সিদ্ধান্তের সমর্থনে ব্যবহার করেছেন, আবার এই পত্রের জ্ঞানপ্রকল্পের সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি। বিশেষ করে বিলিতি-সাহেবদের ভারতচর্চা বঙ্কিমের বিরক্তির ও কৌতুকের কারণ।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনার গোড়াতেই 'অন্তর্দৃষ্টি' ও 'বহির্দৃষ্টি' দুয়ের পার্থক্য নির্দেশ করেছিলেন। এখনকার ভাষায় যাকে 'stereotype' বলে তাকেই বিবেকানন্দ 'বহির্দৃষ্টি' বলে নির্দেশ করেছেন। 'ইয়ুরোপী পর্য্যটক' ও 'ইংরাজ রাজপুরুষ' ভারতবাসীদের বহির্দৃষ্টিতেই দেখেন। তাঁদের কাছে ভারতবর্ষ 'কঙ্কাল পরিপ্লুত মহাশ্মশান', 'স্বার্থপরতার আধার'।

আর ভারতবাসীরাও সাহেবদের 'নববলমধু-পানমত্ত, হিতাহিতবোধহীন হিংস্রপশুপ্রায় ভয়ানক' বলে মনে করেন। বিবেকানন্দের অভিমত, ''দুই দৃষ্টিই বহির্দৃষ্টি, ভেতরের কথা বুঝতে পারে না। বিদেশীকে আমরা সমাজে মিশতে দিই না, ম্লেচ্ছ বলি,—ওরাও কালা দাস বলে আমাদের ঘৃণা করে... দু দলেই ভেতরের আসল জিনিস দেখেনি।" এই ভেতরের আসল জিনিস কী, কীভাবে তা অনুসন্ধান করা যায় তা-ই বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনার বিষয়। নিছক পর্যটক ও নিতান্ত রাজপুরুষের বাইরে আর একদল বিলেতি সাহেব ছিলেন যাঁরা প্রাচ্যজ্ঞানচর্চাকারী। এই প্রাচ্যবিদদের (orientalist) কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা যে-দৃষ্টিভঙ্গি তা ভারতীয়দের একাংশকে খুবই প্রভাবিত করেছিল। নির্বিচারে সেই পাশ্চাত্য-পণ্ডিতদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় অভিমতকে দেশজরা গ্রহণ করতেন। পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির এই নির্বিচার গ্রহণের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ। ভারতীয়দের সংকীর্ণ পাশ্চাত্যবিরোধী মনোভাবের যেমন তাঁরা বিরোধী, তেমনি ভারতীয়দের নির্বিচারে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মতামত মেনে নেওয়ারও তাঁরা পক্ষপাতী ছিলেন না। এডোয়ার্ড সাইদ তাঁর 'Orientalism' বইতে প্রাচ্যকে দেখার ও বিচার করার ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা কীভাবে রাজনৈতিক হাতিয়ারের পরিপূরক হয়ে উঠেছিল তা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, সে তো অনেক পরবর্তী প্রসঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ যখন প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে চিন্তাকুশল তখন একদিকে তাঁদের মনে যেমন সাংস্কৃতিক অস্মিতা ক্রিয়াশীল তেমনই পাশ্চাত্য শিক্ষার স্পর্শে চিন্তার নানা অভিমুখও যে খুলে গেছে এ-বিশ্বাসও তাঁদের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

বিবেকানন্দ তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনায় রাম-নারায়ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন। সে-অবতারণা কখনও কৌতুকের সুরে, কখনও বা সুগম্ভীর ভঙ্গিতে। একদিকে রামায়ণ প্রসঙ্গে তিনি সংকীর্ণ ভারতীয় ধর্মাশ্রয়ীদের নিয়ে রসিকতা করেছেন, অন্যদিকে পাশ্চাত্যের উপনিবেশবাদের সমালোচনা করেছেন। খাদ্যাখাদ্য বিচারে

বিবেকানন্দ উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ধর্মকে ভাতের পাত্রে আটকে রাখতে তিনি নারাজ, লোকাচার ও শাস্ত্র-দর্শনের পার্থক্য নির্দেশ করতে তিনি তৎপর। তাই যে-ভারতীয়রা খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে শুচিবায়ুগ্রস্ত তাঁদের নিয়ে রঙ্গই করেন। 'বিলাতযাত্রীর পত্র' রচনায় লিখেছিলেন, ''আলাসিঙ্গা পেরুমল, এডিটর ব্রহ্মবাদিন, মাইসোরি রামানুজি রসম খেকো ব্রাহ্মণ।... একটায় চিড়া ভাজা, আর একটায় মুড়ি মটর। জাত বাঁচিয়ে, ঐ মুড়ি মটর চিবিয়ে, সিলোনে যেতে হবে।" আলাসিঙ্গাকে খুবই স্নেহ করতেন আচার্য বিবেকানন্দ তবে তাঁর এই নিরামিষপন্থার উদগ্রতা নিয়ে কৌতুক করতে ছাড়েননি। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনায় মজা করে লিখেছেন, ''আধুনিক বৈষ্ণব পড়েছেন কিছু ফাঁপরে, তাঁদের ঠাকুর রাম বা কৃষ্ণ মদ-মাংস দিব্যি ওড়াচ্ছেন, রামায়ণ-মহাভারতে রয়েছে। সীতাদেবী গঙ্গাকে মাংস, ভাত আর হাজার কলসী মদ মান্‌ছেন!"

তিনি নিজে খাদ্যাখাদ্যের বিষয়ে উদার। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থে তাঁর আহারের বিবরণ দিয়েছেন। শিষ্যকে কী নির্দেশ দিলেন তিনি? ''আহার করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন—'মেলাই তেল চর্ব্বি খাওয়া ভাল নয়। লুচি হতে রুটি ভাল। লুচি রোগীর আহার। মাছ, মাংস, fresh vegetable (তাজা তরি-তরকারি) খাবি, মিষ্টি কম।' " বোঝাই যায় খাদ্যের সঙ্গে ধর্মের নয়, স্বাস্থ্যবিধির সম্পর্ক স্বীকার করা হয়েছে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনায় বিবেকানন্দ খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে দুটি নীতিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। প্রথমত, ''এখন সর্ব্ববাদিসম্মত মত হচ্ছে যে, পুষ্টিকর অথচ শীঘ্র হজম হয় এমন খাওয়া দাওয়া।" দ্বিতীয়ত, ''যাঁর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ধর্ম্মজীবন, তাঁর পক্ষে নিরামিষ; আর যাকে খেটে খুটে এই সংসারের দিবারাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবনতরী চালাতে হবে, তাকে মাংস খেতে হবে বৈ কি।"

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনায় আবার রামায়ণের কথা এসেছে শেষের দিকে। এবার আর খাদ্যাখাদ্য নিয়ে কৌতুক নয়। 'রামায়ণ' বিচারের সূত্রে পাশ্চাত্য জ্ঞানকাণ্ডের তিনি বিরোধিতা করছেন। সেই সূত্রেই উঠেছে আর্যদের কথা। আর্যরা বাইরের থেকে ভারতে এসে এদেশের জনজাতিদের নিধন করেছে আর আর্য পরাক্রমের কথাই রামায়ণের নায়ক রামের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে—এই ভাবনার বিরোধিতা করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই 'আর্য' জটিল একটি বিতর্কের উৎস হয়ে উঠেছিল। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে রোমিলা থাপার তাঁর 'The Aryan Question Revisited' (১১ অক্টোবর জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজে প্রদত্ত বক্তৃতা) শীর্ষক বক্তৃতায় জানিয়েছিলেন, ''...the Aryan question is the probably most complex, complicated question in the Indian history. And it requires very considerable expertise in handling both the sources of the questions that arise. The expertise consists of knowing something about at least four different fields..." বিবেকানন্দ যখন আর্য বিষয়ে তাঁর অভিমত প্রদান করছিলেন তখন জ্ঞানচর্চার এই বিবিধ ক্ষেত্রগুলির বিকাশ যথাযথভাবে হয়নি। ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের প্রাথমিক কিছু ভাবনা তখন পণ্ডিতেরা প্রয়োগ করতেন। উইলিয়াম জোন্সের 'Discourses Delivered before the Asiatic Society and Miscellaneus Papers on the Religion, Poetry, Literature, etc. of the Nations of India' বইটি ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটিতে জোন্স ধারাবাহিকভাবে যে-বক্তৃতা (Discourse) প্রদান করেছিলেন তাতে

আর্যরা ভারতে বহিরাগত বলে বিবেচিত। পাশ্চাত্যে যে-ধ্রুপদী সভ্যতা গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে যেমন আর্যদের যোগ, তেমনই ভারতবর্ষের সংস্কৃত সাহিত্যধারা ও সভ্যতার সঙ্গে আর্যদের যোগ। জোন্সের মতে ভারতের বাকি যা-কিছু তা কিন্তু বুনো। তিলকের মতো জাতীয়তাবাদীরা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করছিলেন। ভারতীয় সভ্যতাকে বড় করে তোলা তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি মনে করতেন সুমেরু অঞ্চল থেকে আর্যদের একদল গিয়েছিল ইউরোপে, তাদের অবনমন ও অধঃপতন হয়েছিল। আর একদল আর্য এসেছিল ভারতে—তারা সভ্যতা বজায় রেখেছিল। বিবেকানন্দ তিলকের ভাবনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষীয় আর্য বহিরাগত কি না এই সমস্যার সমাধান অন্যভাবে করতে চাইছেন। তাঁর মতে ইউরোপে আর্যপ্রকৃতির যে-চরিত্র, তার থেকে ভারতে আর্যপ্রকৃতির চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং এই ভিন্নতার সূত্রে বলা চলে ভারতীয় আর্যরা ইউরোপীয় আর্যদের দল নয়, বহিরাগত নয়। আধুনিক গবেষণাপদ্ধতি বিবেকানন্দের সমকালে গড়ে ওঠেনি, সুতরাং ভারতীয় আর্য সম্বন্ধে আধুনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আধুনিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিবেকানন্দের আর্য-চিন্তন মিলবে না। তবে ভারতীয় আর্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে যে-বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ তিনি করেছেন সন্দেহ নেই তা মানবসভ্যতার পক্ষে হিতবাদী। মনে রাখতে হবে গোলওয়ালকরের মতো রাজনৈতিক চিন্তকেরা পরবর্তী কালে যে-উচ্চাভিলাষী আর্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী ধারার প্রবক্তা তার সঙ্গে বিবেকানন্দ বর্ণিত আর্যচরিত্রের মিল নেই।

বিবেকানন্দ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনায় আর্যদের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এই ভাবনার সূত্রপাত তাঁর পূর্ববর্তী 'বর্ত্তমান ভারত' রচনায়। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, ''সে ইংলণ্ডের ধ্বজা-কলের চিম্‌নি, বাহিনী-পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র-জগতের পণ্যবীথিকা এবং সম্রাজ্ঞী—স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।'' এই প্রবণতার অধিকারী কখনও তাঁর মতে আদি ভারতীয়রা ছিলেন না। আদি ভারতীয়রা কেমন ছিলেন? এই ভারতীয়দের আদি হিসেবে যে আর্যদের তিনি নির্দেশ করছেন তাঁরা কেমন? 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনায় লিখলেন, ''আর্য্যরা শান্তিপ্রিয়, চাষ বাস করে, শস্যাদি উৎপন্ন করে, শান্তিতে স্ত্রী পরিবার পালন কর্ত্তে পেলেই খুসী। তাতে হাঁফ ছাড়বার অবকাশ যথেষ্ট; কাজেই চিন্তাশীলতার, সভ্য হবার অবকাশ অধিক।'' 'হাঁফ ছাড়বার অবকাশ' এই শব্দবন্ধ গুরুত্বপূর্ণ—অবসর, উদ্বৃত্ত সময় (Surplus time) সৃজন ও সভ্যতাকে সম্ভব করে। যুদ্ধপ্রিয়রা এই উদ্বৃত্ত সময় পায় না।

এই শান্তিপ্রিয় পালনকারী চরিত্রই বিবেকানন্দের মতে রামায়ণের নায়ক রামেরও বৈশিষ্ট্য। ''রামায়ণ কি না আর্য্যদের দক্ষিণি বুনো-বিজয়!! বটে—রামচন্দ্র আর্য্য রাজা সুসভ্য, লড়ছেন কার সঙ্গে?—লঙ্কার রাবণ রাজার সঙ্গে। সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড় বই কম নয়। লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশি ছিল বরং, কম ত নয়ই। তারপর বানরাদি দক্ষিণি লোক বিজিত হলো কোথায়? তারা হলো সব শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধু, মিত্র। কোন্ গুহকের, কোন্ বালির রাজ্য, রামচন্দ্র ছিনিয়ে নিলেন—তা বল না?''

পাশ্চাত্যের উপনিবেশবাদী দখলদারিত্বের সঙ্গে রামের কাজকর্মের যে একেবারেই মিল নেই তা বোঝাতে চান বিবেকানন্দ। একথাও বলতে চান অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, নিউজিল্যান্ডে যেভাবে সেখানকার জনজাতিদের পাশ্চাত্যের সভ্যরা শেষ করে দিয়েছেন তার সঙ্গে রামের অয়নের কোনও তুলনাই চলে না। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা নিজেদের যুদ্ধবাজ-প্রকৃতি রামায়ণের রামের ওপর আরোপ

করতে চাইছেন। এ অন্যায়, বানানো কল্পনা মাত্র। বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষভাবে বিলিতিদের উদ্দেশ করে লিখলেন, ''যেখানে দুর্ব্বল জাতি পেয়েছ, তাদের সমূলে উৎসাদন করেছ; তাদের জমীতে তোমরা বাস করছ, তারা একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তোমাদের আমেরিকার ইতিহাস কি? তোমাদের অস্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, পাসিফিক্ দ্বীপপুঞ্জ, তোমাদের আফ্রিকা?''

বিবেকানন্দের রামায়ণ ভাষ্য এভাবে একদিকে উপনিবেশবাদী পাশ্চাত্যের নীতির সমালোচনা হয়ে উঠেছে। বস্তুতপক্ষে যাঁরা রামকে যুদ্ধপরায়ণ প্রবল পরাক্রমী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চান তাঁরা আসলে বিবেকানন্দের মতে পাশ্চাত্যের জ্ঞানকাণ্ডপ্রসূত ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত। এই প্রজানুরঞ্জক রামের প্রসঙ্গ বিবেকানন্দের পূর্ববর্তী রচনা 'বর্ত্তমান ভারত'-এও ছিল। সেখানে বিবেকানন্দ মহাকাব্যের চরিত্রকে ইতিহাসের চরিত্রের পাশে স্থাপন করেছিলেন। রামচন্দ্র, ধর্মাশোক ও আকবর এই তিন শাসককে তিনি সমগোত্রীয় বলে মনে করেন। তিনজনেই প্রজানুরঞ্জক।

''একজন রামচন্দ্র শত শত অগ্নিবর্ণের পরে জন্মগ্রহণ করেন। চণ্ডাশোকত্ব অনেক রাজাই আজন্ম দেখাইয়া যান। ধর্ম্মাশোকত্ব অতি অল্পসংখ্যক; আকবরের ন্যায় প্রজারক্ষকের সংখ্যা আরঙ্গজীবের ন্যায় প্রজাভক্ষকের অপেক্ষা অনেক অল্প।''

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনায় বিবেকানন্দ তাঁর রামায়ণ ভাষ্যে উপনিবেশবাদী ইংরেজদের তুলনায় রাম কতটা মানবিক সেকথা প্রতিষ্ঠা করলেও পূর্ববর্তী রচনা 'বর্ত্তমান ভারত'-এ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ পাঠকের কাছে নিবেদন করেছিলেন। এই যে প্রজানুরঞ্জন, প্রজাহিতের আধিক্য এর একটি নেতিবাচক দিকও আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতীয় জনসাধারণের স্বাধিকারের প্রসঙ্গটি নানাভাবে উচ্চারিত। ভারতবর্ষীয় জনগণ কেন পাশ্চাত্যের 'পাব্লিক'-এর মতো নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছে না তা চিন্তকদের আলোচনার বিষয়। বিবেকানন্দ রামায়ণের সূত্রে একরকমভাবে সেকথার উত্তর দিয়েছেন :

''হউন যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্র বা ধর্ম্মাশোক বা আকবর, পরে যাহার মুখে সর্ব্বদা অন্ন তুলিয়া দেয়, তাহার ক্রমে নিজের অন্ন উঠাইয়া খাইবার শক্তি লোপ হয়। সর্ব্ব বিষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষা-শক্তির স্ফূর্তি কখনও হয় না। সর্ব্বদাই শিশুর ন্যায় পালিত হইলে অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘকায় শিশু হইয়া যায়। দেবতুল্য রাজা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পালিত প্রজাও কখনও স্বায়ত্তশাসন শিখে না।''

একদিকে বিবেকানন্দ রামের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদের দুস্তর পার্থক্য দেখাচ্ছেন অপরদিকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় প্রজাদের 'স্বায়ত্তশাসন' করার দাবি কেন প্রবল হচ্ছে না তারও কারণ রাম ও রামতুল্য পরবর্তী শাসক ধর্মাশোক ও আকবরের পালনরীতির মধ্যে খুঁজছেন। বিবেকানন্দের রামায়ণ ভাষ্য সন্দেহ নেই ঔপনিবেশিক বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে উঠেছে। রাম এমন একটি অধিকরণ যাঁর সামনে ভারতবর্ষীয়রা নানাভাবে নানা সময়ে উপস্থিত হন। বিবেকানন্দও তার ব্যতিক্রম নন। তবে বিবেকানন্দের রামানুসন্ধান মানবতাবাদী ও হিতকর। অপরকে হত্যা করে, অপরের ধর্ম বিনষ্ট করে সেই ধ্বংসের ওপর রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার অনৈতিক স্বপ্ন কখনও তিনি দেখেননি।

তিনি বিশ্বাস করেন 'দুর্ব্বলকে রক্ষা কর্‌বার জন্য' নিয়ম নির্মাণ করতে হয়—রাম তা করতে পেরেছিলেন।